بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ থেকে মজলিসে আনসারুল্লাহ্ এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের ইজতেমা শুরু হচ্ছে। আমাদের ইজতেমা সমূহের আসল রূহ বা উদ্দেশ্য অথবা যার জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বে যেন উন্নতি সাধিত হয়। ইলমী বা জ্ঞানগত অনুষ্ঠানাদি আর প্রতিযোগিতা সমূহ এই রূহ বা প্রেরণার সাথে হওয়া উচিত যে, এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সেগুলোকে আমাদের নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করতে হবে। সেইসাথে খেলাধূলারও বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকে, আর তা এজন্য কেননা 'হুকূকুল্লাহ্' এবং 'হুকূকুল ইবাদ' আদায় করার জন্য সুস্বাস্থ্যও আবশ্যক। নতুবা না আনসারুল্লাহ্র এখন খেলাধূলার বয়স আছে আর না সাধারণত ২২/২৩ বছর বয়সের পর মহিলারা খেলাধূলায় অধিক আগ্রহ রাখে। অতএব, ব্যয়াম বা খেলাধূলার প্রতিযোগিতা সমূহের একটি উদ্দেশ্য হলো নিজেদের দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতি যেন সচেতনতা থাকে। আর কেবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরাই নয় বরং অন্যরাও যেন অন্তত পক্ষে ভ্রমণ বা হালকা ধরণের ব্যয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের দেহকে উদ্যমী ও কর্মক্ষম করে রাখে। যাহোক, এসব ইজতেমার আসল উদ্দেশ্য হলো, নিজেদের ধর্মীয় এবং জ্ঞানগত যোগ্যতা সমূহকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে যেন আমাদের মনোযোগ সৃষ্টি হয়। আনসারুল্লাহ্-র সদর সাহেব খুতবায় আনসারদের সম্বোধন করে কিছু বলার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। আনসারুল্লাহ্র বয়স-সীমা হলো এমন একটি বয়োপ্রাপ্তি কাল যখন মানুষের চিন্তাধারা পরিপক্ক ও দৃঢ়তর হয়ে থাকে। আর তাদের মাঝে নিজেদের দায়িত্ববোধের চেতনা নিজ থেকেই জাগ্রত হওয়া উচিত এবং এসব দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। প্রথমত পরিণত বয়স হওয়া আর দ্বিতীয়ত, এই পরিণত বয়সের লোকদের সংগঠনের নাম 'আনসারুল্লাহ্' হওয়া, চল্লিশোর্ধ্ব বয়স প্রত্যেক আহমদী পুরুষের মাঝে নিজ দায়িত্ব পালনের চেতনা সদা জাগ্রত থাকার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। এসব দায়িত্বাবলী কি যা একজন নাসেরের পালন করা উচিত? আনসারুল্লাহ্র আহাদনামায় এর সারাংশ বিধৃত রয়েছে। প্রথম কথা হলো, মজলিস আনসারুল্লাহ্র প্রতিটি সদস্য ইসলামের দৃঢ়তা এবং আহমদীয়াতের ওপর আন্তরিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাবে আর ইসলামের দৃঢ়তার জন্য এই প্রচেষ্টা নিজ জ্ঞান এবং শক্তিবলে সম্ভব নয়। ইসলাম খোদার প্রেরীত ধর্ম আর শিক্ষার সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সম্পূর্ণ তথা পরিপূর্ণ ধর্ম। কোন মানুষের এতে আর বাড়তি কোন দৃঢ়তা সৃষ্টি করতে হবে না বা করতে পারেও না। হ্যাঁ, এর সাথে নিজের দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করা উচিত

যেন আমরা এই কামেল তথা সম্পূর্ণ ধর্মের দৃঢ় অংশ হতে পারি, আর এটি খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা ছাড়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রত্যেক আহমদীর চেষ্টা করা উচিত, আর আনসারুল্লাহ্‌র মান বা স্ট্যান্ডার্ড এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নত হওয়া চাই। খোদার সাথে সম্পর্ক ততক্ষণ পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত না হবে, যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর এবং এর প্রতি মনোযোগী হও। অতএব, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায় সেই দায়িত্বও আমাদের পালন করতে হবে। বয়আতের অঙ্গীকার পালনের এই দাবি পূরণ করতে পারলে আমরা সত্যিকার অর্থে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারব। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের প্রচারের কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। আর আহমদীয়াতের ওপর আন্তরিকভাবে বা সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কেবল তখনই প্রমাণিত হবে, যখন আমরা ইসলামের প্রচার এবং তবলীগের কাজে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হয়ে নিজেদেরকে 'আনসারুল্লাহ্'-র অংশ প্রমাণ করতে সক্ষম হব। অতএব এটি হলো প্রথম দায়িত্ব।

এছাড়া আনাসারুল্লাহ্ তাদের আহাদনামায় আরো একটি অঙ্গীকার করে বা অন্যভাবে এটি বলা যায় যে, এই দায়িত্ব পালন এবং এই বোঝা বহনে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আর সেই সাথে ঘোষণাও করে যে, তারা খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে এবং এর হিফাযতের সর্বাত্মক চেষ্টায় নিয়োজিত থাকবে। আর এই চেষ্টা করা হবে কিভাবে? এটি তখনই সম্ভব, যখন আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যরা খিলাফতের কাজ এবং পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এর সাহায্যকারী হবে। এটি তখনই হতে পারে যদি আনসারুল্লাহ্ সবসময় খলীফায়ে ওয়াক্তের কথা শুনার প্রতি নিজেদেরকে মনোযোগী করে রাখে, আর এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে আমাদেরকে (স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল) এমটিএ রূপী নিয়ামত প্রদান করেছেন যার মাধ্যমে অনেক দূর-দূরান্তে বসা থাকলেও তা শোনা সম্ভব।

অতএব আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের উচিত এর সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা। অনুরূপভাবে আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যরা এই অঙ্গীকারও করেছেন যে, নিজ সন্তানদেরকে তারা খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করবেন। অতএব, এর মাধ্যমে নিজ সন্তানদের অন্যান্য তরবিয়তের পাশাপাশি খিলাফতের সাথেও যুক্ত বা সম্পৃক্ত করুন যেন প্রজন্ম পরম্পরায় বিশ্বস্ততার এই ধারা অব্যাহত এবং প্রতিষ্ঠিত থাকে আর ইসলামের সেবা, প্রচার ও প্রসারের কাজ যেন সদা চলমান থাকে, কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর ইসলামের প্রচার এবং প্রসারের কাজ তাঁরই ঘোষণা অনুসারে কুদরতে সানীয়ার মাধ্যমে হওয়ার কথা, আর তা হলো খিলাফতের ব্যবস্থাপনা। অতএব এর জন্য সকল প্রকার কুরবানীর যে অঙ্গীকার আপনারা করেছেন সেটি পালনে যত্নবান ও সচেষ্ট হোন এবং এ

সম্পর্কে সর্বদা সজাগ ও সচেতন থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

অনুরূপভাবে যেমনটি আমি বলেছি, লাজনা ইমাইল্লাহ্‌রও ইজতেমা হচ্ছে আর তাদেরও একটি অঙ্গীকার রয়েছে যা তাদের সবসময় নিজেদের সামনে রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় ফযল এবং এহসান যে, তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে লাজনাদের অধিকাংশ বা সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যাগণ ধর্মের ওপর বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাসের দিক থেকে তাদের অধিকাংশ সুদৃঢ়ভাবে দন্ডায়মান রয়েছেন আর বিশ্বাসে তারা দৃঢ়তাও রাখেন, কিন্তু লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রতিটি সদস্যা ও প্রত্যেক আহমদী নারীর নিজের ব্যবহারিক অবস্থাকেও আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের নির্দেশিত মানে পৌঁছাতে হবে। আমি যেমনটি বলেছি লাজনাদেরও একটি আহাদনামা রয়েছে। আর নিজেদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা ফাংশানে তারা এই আহাদনামা পাঠও করে থাকেন যে, আমরা আমাদের ধর্মের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব। অতএব, ধর্ম প্রথম যে কুরবানী চায় বা দাবি করে তা হলো নিজেদের সমস্ত জাগতিক কামনা-বাসনাকে পিছনে ফেলে নিজেদের ব্যবহারিক জীবনকে ধর্মীয় শিক্ষা সম্মত করুন। এক আহমদী নারীর মাঝে সত্যের উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এছাড়া নারী-সংশ্লিষ্ট যেসব শিক্ষা ধর্মে রয়েছে সেই শিক্ষাগুলো মেনে চলাতে সচেষ্ট থাকা উচিত। নিজেদের পবিত্রতা বা সম্ভ্রমের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্ তা'লা মহিলাদেরকে যেসব বিশেষায়িত শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলোর মাঝে পর্দাকে অসাধারণ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যদি কোন আহমদী মহিলার মাঝে এই ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকে তাহলে সে কার্যত নিজের অঙ্গীকার পালন করছে না। সুতরাং সমাজের ভয় বা নিজের জাগতিক কামনা-বাসনা যেন এক আহমদীকে ধর্মের শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দিতে না পারে। বরং সকল আহমদী নারীর নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থাকে খোদা প্রদত্ত শিক্ষা সম্মত করা উচিত।

এরপর আরো একটি অঙ্গীকার হলো সদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকার। এই ক্ষেত্রেও প্রত্যেকের নিজেদের মানের প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত যে, আমরা সত্যের প্রকৃত রূহের সাথে এর ওপর অধিষ্ঠিত রয়েছি কিনা। অনুরূপভাবে সন্তান-সন্ততির তরবিয়ত বা সুশিক্ষারও অঙ্গীকার রয়েছে। এই অঙ্গীকারও পুরোপুরি পালনের চেষ্টা করা উচিত যে, সন্তানরা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট কিনা। সন্তানের সবচেয়ে উত্তম তরবিয়তগাহ্ হলেন মা। অতএব এর জন্য মায়েদের সর্বাত্মক চেষ্টায় লেগে থাকা উচিত। যদি আমাদের সকল মহিলা এই দায়িত্ব পালনকারী হয়ে যায়, বরং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, শতকরা পঞ্চাশ ভাগও যদি এমন হয় তাহলে তারা পরবর্তী প্রজন্মের সুরক্ষার নিশ্চয়তা হয়ে যাবেন। তারা তাদের ধর্মের সুরক্ষার কারণ হবেন। খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের কারণ হবেন। অনুরূপভাবে নিজ সন্তানদের মাঝে স্বজাতি ও দেশের জন্য ত্যাগ এবং কুরবানীর প্রেরণা ও চেতনা সঞ্চার করার দায়িত্বও মায়েদের। আর এই অঙ্গীকারও আপনারা আপনাদের আহাদনামায় করে থাকেন। তাদের মন-মানসিকতাকে পরিপূর্ণভাবে আইনের প্রতি

শ্রদ্ধাশীল হওয়া শেখানো মায়েদের কাজ। ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য করার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করাও মায়েদের কাজ। স্বদেশের উন্নতির জন্য নিজ ভূমিকা পালন করা এবং এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার দায়িত্বও মায়েদের। খিলাফতের সাথে সন্তানদের সম্পৃক্ত করা এবং এর জন্য চেষ্টা করা যেভাবে পিতাদের কাজ একইভাবে এটি মায়েদেরও দায়িত্ব। অতএব এই মহান দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মাকে সচেতন হতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও এর তৌফিক দিন।

অনুরূপভাবে লাজনার সাথে নাসেরাতুল আহমদীয়ার ইজতেমাও হচ্ছে। নাসেরাতও একটি অঙ্গীকার করে। তাদেরও নিজেদের অঙ্গীকার পালন করা উচিত। ১৪/১৫ বছর বয়সটি সাবালক হওয়ার বয়স হয়ে থাকে এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য করার যোগ্যতাও তখনই সৃষ্টি হয়। এটি নাসেরাতের বয়সের শেষ সীমা। আর এই বয়সেই অনেক কামনা-বাসনাও থেকে থাকে। যদি বস্তুবাদিতার প্রতি দৃষ্টি থাকে তাহলে জাগতিক কামনা-বাসনা ধর্মের ওপর প্রাধান্য পেয়ে যায়। তাই প্রত্যেক আহমদী মেয়ের অত্যন্ত সাবধান এবং সচেতন থাকা উচিত। আর নিজেদের আহাদ বা অঙ্গীকারনামাকে বারবার পুনরাবৃত্তি করা উচিত যেন প্রত্যেক আহমদী মেয়ে জাগতিক কামনা-বাসনার অনুকরণ করার পরিবর্তে মহান লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে সচেষ্ট হয়। আর নাসেরাতের আহাদনামায় সেই মহান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ধর্ম, জাতি এবং স্বদেশের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকা, সবসময় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, আহমদীয়া খিলাফতের খাতিরে সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা। অতএব আমাদের মেয়েরা যদি এইসব অঙ্গীকার প্রতিপালন করাকে নিজেদের জীবনের অংশ বানিয়ে নেয়, তাহলে নিজেদের জীবনকে সুরক্ষিত করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনেরও তারা হিফাযতকারিনী হবেন এবং তাদেরকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্তকারিনী হবেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও এই তৌফিক দিন, আর এই যে সব ইজতেমা হচ্ছে সেগুলোকে সকল অর্থে বরকতময় করুন।

ইজতেমার প্রেক্ষাপটে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এখন আমি এক প্রিয়ভাজনের স্মৃতিচারণ করতে চাই যিনি সম্প্রতী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে এক দুর্ঘটনার ফলশ্রুতিতে এক প্রিয়ভাজন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আর কয়েকদিন পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া ইউ কে-এর আরেকজন অতি প্রিয় ছাত্র এবং যুবক, যে জামেয়ার শিক্ষা প্রায় সমাপ্ত করতে যাচ্ছিল, কিন্তু কিছু দিন অসুস্থ থাকার পর আমাদের ছেড়ে সে চলে গেছে। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ।

আমি যেই যুবকের উল্লেখ করেছি তার নাম হলো মাযহার আহসান। সে অসুস্থ্যতার কারণে শেষ বর্ষের পরীক্ষা দিতে পারেনি, কিন্তু এই যুবক যেভাবে জীবন অতিবাহিত করেছে পরীক্ষা পাস করুক বা না করুক সে মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগই ছিল। আল্লাহ্ তা'লা এই যুবকের মাঝে এক প্রবল আকাঙ্কা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন যে, কিভাবে ধর্মের খিদমত করা যায়, কিভাবে নিজের নৈতিক এবং চারিত্রিক অবস্থাকে খোদা তা'লার শিক্ষা সম্মত করা যায় এবং এর ওপর আমল করা যায়। এই পৃথিবীতে যে-ই আসে তাকে একদিন এখান থেকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু তারা সৌভাগ্যবান হয়ে

থাকে যারা নিজেদের জীবনকে খোদার ইচ্ছা অনুসারে কাটানোর চেষ্টা করে এবং এই ক্ষেত্রে সাফল্যও লাভ করে।

এই প্রিয়ভাজন সম্পর্কে জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র, তার বন্ধু-বান্ধব এবং শিক্ষকগণ আমাকে লিখছেন, আর এগুলো শুধু প্রথাগত কোন কথা নয় যে, এক ব্যক্তি মারা গেলে তার যিকরে খায়ের করা হয়। বরং আমি ব্যক্তিগতভাবেও জানি যে, এই যুবক নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা আর ব্যবহারিক আচরণের ক্ষেত্রে এক নমুনা বা আদর্শ ছিল। আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। এই প্রিয় মরহুম পিতামাতার একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন। তার দুই বোন রয়েছে। তার পিতামাতাও, বিশেষ করে মা ধৈর্য্য এবং খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও পুরস্কৃত করুন এবং ধৈর্য্য শক্তিতে বৃদ্ধি করুন। তাদের সবাইকে নিজ পক্ষ থেকে মানসিক প্রশান্তি দিন এবং ধৈর্য্যের উপকরণও সৃষ্টি করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন,

স্মরণ রেখ! সমস্যা বা বিপদের ক্ষতের জন্য আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করার মত এমন আরামদায়ক ও প্রশান্তিকর কোন মলম নেই। অতএব সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার ওপরই ভরসা হওয়া উচিত। এই প্রিয়ভাজনও ধৈর্য্য এবং মনোবলের নসীহত করতে করতেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। দুঃখ হয়েই থাকে, কেননা এটি এক স্বাভাবিক বিষয়। আর পিতামাতা এবং ভাইবোন এর দুঃখ-কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এই দুঃখ আর বেদনাকে দোয়ায় রূপ দিয়ে মরহুমের মর্যাদার উন্নতি এবং নিজেদের জন্য ধৈর্য্যের ও প্রশান্তির কারণ করতে পারি আমরা। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের নিকটাত্মীয়দেরও এর তৌফিক দান করুন। আমি এখন সংক্ষিপ্ত আকারে তার কিছুটা যিকরে খায়ের করছি। এই যুবক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় চিকিৎসার ফলে আরোগ্যও লাভ করেছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তার বুকে এমন কোন প্রদাহের সংক্রমন ঘটে যা ডাক্তাররা সময়মত চিহ্নিত করতে পারেনি, আর এ কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন। إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমের বড় দাদা মিস্ত্রী নিযাম উদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। আর তার নানা মোহতরম চৌধুরী মুনাওয়ার আলী খান সাহেব এবং দাদা হাজী মঞ্জুর আহমদ সাহেব উভয়ই কাদিয়ানের দরবেশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মরহুম জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র ছিলেন, যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি। এছাড়া এই যুবক মূসীও ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত কথা বলবো কেননা দীর্ঘ কিছু আবেগঘন কথা এমনও আছে যা হয়তো বলা কঠিন হবে, কিন্তু যাহোক সংক্ষেপে আমি উল্লেখ করছি, তার মা বলেন, সে আমার পরামর্শদাতা, আমার গোপনীয়তা রক্ষাকারী এবং এক শিক্ষকের মত সবসময় আমাকে বুঝাতো। আমাদের মাঝে মা ছেলের সম্পর্কের পাশাপাশি একটি ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা বোঝাপড়াও ছিল। সে আমাকে ভালোভাবে বুঝতো আর আমিও তাকে বুঝতাম। সে ভালোভাবেই এটি জানতো যে, আমার মা কিসে আনন্দিত হন আর কোন বিষয়ের প্রতি তিনি ঘৃণা পোষণ করেন। তিনি বলেন, প্রায় সময়ই সে

আমার সাথে খিলাফত ব্যবস্থা, খলীফায়ে ওয়াক্ত, জামাত আর সবচেয়ে বেশি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহাবা এবং তাঁর প্রকৃত প্রেমিক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিষয়ে কথা বলতো আর এগুলোই তার পছন্দের বিষয় ছিল। কথার মাঝে জাগতিক কোন বিষয় এসে পড়লে সে বলতো, এসব কথা বাদ দিন, এগুলোর সাথে আমাদের কি-ইবা সম্পর্ক। এ বছর জলসায় আসার তার প্রবল বাসনা ছিল। কিন্তু সে বুঝতে পারে যে, যাওয়া কঠিন হবে তাই এমটিএ-তে জলসা শুনা-ই যুক্তিযুক্ত মনে করেছে। আর ঘরের অন্য সদস্যদের বলেছে, আপনারা যান, তখন গ্লাসগো-তে ছিল, আমি একা থাকব এবং ম্যানেজ করে নিব, আপনারা কোন চিন্তা করবেন না। এভাবে অসুস্থ্যতা সত্ত্বেও ঘরের লোকদেরকে সে জলসায় পাঠিয়ে দেয় যে, আপনারা গিয়ে জলসা শুনুন। নিজের সব কাজ তার নিজেরই করার অভ্যাস ছিল। তার মা বলেন, অসুস্থ্যতার সময় তার চিন্তাধারা এবং স্বভাবে আরো স্থিরতা এবং বিনম্রতা সৃষ্টি হয় আর কখনো রাগ বা খিটখিটে মনমানসিকতা তার মাঝে দেখা যায়নি। আমি যেমনটি বলেছি, প্রথম রোগ, ব্লাড ক্যান্সার থেকে যখন সে আরোগ্য লাভ করে তখনও দুর্বলতা ছিল কিন্তু স্কটল্যান্ড-এর আমীর সাহেবকে সে বলে যে, আমাকে কিছু জামাতী কাজ দিন, আর এরই প্রেক্ষিতে সেখানে সে নিউজ লেটার প্রকাশ করা আরম্ভ করে। আর এর জন্য জামাতের অন্যান্য কর্মীদের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকতো এবং তাদেরকে বলতে ও বুঝাতে থাকতো যে, কিভাবে এসব কাজ করতে হয়।

অনুরূপভাবে স্কটল্যান্ড-এ লাজনা ও নাসেরাতের ইজতেমা ছিল, সেখানে সে তাদের জন্য সার্টিফিকেট বা সনদ ডিজাইন করে দেয়। সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক নিয়মিত পাঠ করতো। তার মা বলেন, ১২ই সেপ্টেম্বর পুনরায় যখন প্রদাহে আক্রান্ত হয়, সম্ভবত এই দিনই ছিল, তিনি বলেন, সে আমাকে ডাকে এবং বলে, আমার কাছে এসে বসুন। এরপর বলে, আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজি বা কৃপাবারিকে নিজের আঙ্গুলে গণনা করুন। আমি গণনা আরম্ভ করি। সে বলে, আরো গণনা করুন। আমি বলি যে, আল্লাহ্ তা'লার এত কৃপারাজি রয়েছে যে, আমি গণনা করে তা শেষ করতে পারব না। তখন মাযহার বলে যে, ব্যস্, আমি আপনাকে এ কথাই বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপা এবং অনুগ্রহরাজি সবসময় স্মরণ রাখুন আর সর্বাবস্থায় তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে রত থাকুন। তার মা বলেন, আমি তখনও বুঝতে পারিনি যে, মাযহার আসলে কী বলতে চাচ্ছে। কিন্তু যাহোক মানসিকভাবে সে হয়তো আমাকে প্রস্তুত করছিল।

তার মা বলেন, তবশীর বিভাগের অতিথিরা যখন স্কটল্যান্ড আসেন তখন শেষ কাফেলার ইনচার্য ছিলেন রাজা বোরহান সাহেব। তিনি মাযহারের সাথে সাক্ষাত করে অত্যন্ত আনন্দিত হন যে, মাযহারের স্বাস্থ্য পূর্বের চেয়ে ভালো হয়েছে। আমি তাকে বলি যে, মুরুব্বী সাহেব! মাযহারের মাঝে জামাতী কাজ করার একটি উন্মাদনা রয়েছে। সে সবসময় পরিকল্পনা করতে থাকে যে, ভবিষ্যতে এই কাজ করব আর তা এভাবে করব। আর মুরুব্বী হতে পারলে এভাবে কাজ করব। ২০১৫ সনের

অক্টোবরে যখন তার ক্যান্সার ধরা পড়ে তখন সে নিজের বোনকে বলে যে, আম্মাকে খুব সাবধানতার সাথে জানাবে। তার কান্না আমি সইতে পারি না।

হাসপাতালে থাকাকালেও সে নামায আদায়, তিলাওয়াত করা আর এমটিএ-তে খুতবা অবশ্যই শুনতো। অনলাইন প্রোগ্রামে নযম, ছবি ইত্যাদি সবই দেখতো। সেখানে তার সহপাঠি এবং শিক্ষকদের সাথেও কথা হতো। ডাক্তার এবং নার্সদের সাথেও সে জামাতের তবলীগের কথা বলতো। হাসপাতালে থাকাকালে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সবসময় উঠে বসে থাকা অবস্থায় নিজের চিকিৎসা নিয়েছে। এছাড়া পীস কনফারেন্স, জলসা এবং জামাতের বিভিন্ন কার্যক্রমের বরাতে সবসময় ডাক্তারদের তবলীগ করতো। জলসার পর এখানে মুরুব্বীদের যে মিটিং হয় তাতে সদ্য জামেয়া পাশ করা তার সহপাঠিরাও অংশ নেয়, সে তাদেরকে লিখিত পয়গাম পাঠায় যে, মিটিংয়ের পয়েন্টস্‌গুলো আমাকেও লিখে পাঠাবেন যেন আমি সেগুলোকে নিজ জীবনে অঙ্গীভূত করে নিতে পারি কেননা মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য সম্ভব নয়। খিলাফতের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল সুগভীর। তার মা বলেন, আর রেযার মৃত্যু সংবাদ যখন সে শুনতে পায় তখন প্রথমবার তাকে আমি এইভাবে কাঁদতে দেখেছি। এতে প্রথমে আমার কিছুটা আশঙ্কা হয়, কিন্তু যাহোক তার হয়তো তখন এই চিন্তা হয়েছিল যে, এই ছেলে অকস্মাৎ মারা গেছে তার পিতা-মাতাও এবং খলীফায়ে ওয়াক্তও তাই অসাধারণভাবে শোকাভীভূতই হবেন।

তিনি বলেন, আমরা আমাদের খোদার ইচ্ছায় সন্তুষ্ট যে, আমরা আল্লাহ্‌রই আর তিনি তাঁর কাজ করেছেন। আমাদের কাজ ছিল দোয়া করা, গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। তিনি বলেন, মাযহার বিদায় নিতে থাকাকালেও আমাদের সংশোধন এবং তরবিয়তের কাজ করে গেছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর ঈদের দিন সকালে মাযহারের ভয়াবহ রকমের কাশি হয়। সে আমাকে চা বানিয়ে দিতে বলে এবং বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। আমি গিয়ে দেখি তার প্রবল জ্বর। তাই এম্বুলেন্স ডাকা হয় এবং যাওয়ার সময় সে পুনরায় বলে, আজ ঈদের দিন, অতএব আপনারা ঈদ (এর নামায) পড়তে যান, আমার সাথে হাসপাতালে আসার কোন প্রয়োজন নেই, আমি সেখান থেকে কিছুক্ষণ পর ফোনে আপনাদেরকে ডেকে নেব। আর সেখানে গিয়ে আমিও আমার ফোনে ঈদের খুতবা শুনে নিব। সেই অসুস্থতার মাঝেও সে এই বিষয়গুলো মনে রাখে।

তার পরলোক যাত্রা হয় ভোর বেলায়। তার বোন বলেন, মাযহারের কণ্ঠস্বর ভালো ছিল, ফোনে তিনি নিজ ভাইয়ের কণ্ঠ রেকর্ড করে রেখেছিলেন এবং এলার্ম দিয়ে রেখেছিলেন ফজরের নামায বা তাহাজ্জুদের জন্য। তিনি বলেন, যখন তার মৃত্যু-ক্ষণ সময় ঘনিয়ে আসে এবং শেষ নিশ্বাসের নির্ধারিত সময় হয় তখন ফোনের এলার্মে তারই কণ্ঠে আযানের ধ্বনি শুরু হয় যা আমাদেরকে আরো বেশি আবেগ-প্রবণ করে দেয়। কিন্তু যাহোক এতেই ছিল খোদার সন্তুষ্টি।

অনেক ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন তিনি। তার বোন রুবা বলেন, নিজের ক্যান্সার সম্পর্কে জানার পর সে বলে যে, আমার জন্য সবকিছু সহ্য করা সম্ভব কিন্তু আমার মায়ের ক্রন্দন আমি দেখতে

পারি না, তাই মাকে খুব সাবধানে জানাবে। তার বোনমেরো আক্রান্ত হয় আর তার বোনেরটিই মিলে যাওয়ায় তা তাকে দেয়া হয়। আর ডাক্তাররাও এতে আশ্চর্যান্বিত ছিল কেননা প্রথমে বলা হয়েছিল যে, হবে না কিন্তু যাহোক তা ম্যাচ হয়ে যায়, যার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে আরোগ্যও দান করেছিলেন। কিন্তু যাহোক শেষ অব্দি নিয়তি এটিই ছিল। ক্যামোথেরাপি নেয়ার সময়ও তিনি ডাক্তারদের তবলীগ করা অব্যাহত রাখেন। খোদার সত্তায় তার গভীর তাওয়াক্কুল বা ভরসা ছিল, এছাড়া আর কোন কিছুর চিন্তা ছিল না। সর্বদা সে এটিই বলতো যে, খোদা কখনো আমাকে ব্যর্থ করবেন না। কিন্তু যাহোক আল্লাহ্ তা'লা এখান থেকে তাকে নিয়ে গেছেন, আশা করি পরকালে তার সেসব বাসনা পূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ্।

ডাক্তার হাফিয সাহেব বলেন, ক্যান্সার সনাক্ত হওয়ার পর মাযহারের সাথে সাক্ষাত করতে আমি গ্লাসগো যাই এবং তাকে অত্যন্ত আস্থাশীল মানুষ হিসেবে পাই। সেখানে তার মা বলেন, সে সব সময় বলে যে, সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখবেন। মোহতারমা বেনজির রাফে সাহেবা গ্লাসগোতে বসবাস করেন। তিনি বলেন, আমি আসলে একজন শ্রীলঙ্কান। মাযহারের মা ও বোনদের সাথে আমার গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে। তার ক্যান্সার ধরা পড়ার পর তাদের পরিবারের সাথে আরো ভালোভাবে পরিচয় হয়েছে। আমরা তাকে দেখার জন্য যখন হাসপাতালে যাই তখন সে অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে এবং ধৈর্য্যের সাথে তার অসুস্থতা সম্পর্কে আমাদের অবগত করে আর যখন সে এই রোগ থেকে সুস্থ্য হয়ে যায়, মাঝে কিছু দিনের জন্য সে এই রোগ থেকে সুস্থ্য হয়েছিল, তখন গ্লাসগোতে একটি পাঁচ কিলোমিটার চ্যারিটি ওয়াক হয় যাতে সে অংশগ্রহণ করে। আর সে বলে যে, এটি কঠিন ছিল না, আমি খুব সহজেই তা সম্পন্ন করেছি। যদিও সে এক দীর্ঘ সময় অসুস্থতায় অতিবাহিত করেছিল। ক্যামোথেরাপি ইত্যাদি নিজেই তো একটি কষ্টদায়ক প্রক্রিয়া।

হাফেয ফযলে রাব্বী সাহেব বলেন, কুরআন করীম শেখার ক্ষেত্রে সে অত্যন্ত উৎসাহী ছিল, সুললিত কণ্ঠে ও হৃদয়গ্রাহী সুরে কুরআন তিলাওয়াত করত আর জামেয়াতে আসার পূর্বেই সে জাতীয় তালীমুল কুরআন ক্লাসে অংশগ্রহণের জন্য স্বীয় পরিবারের সাথে গ্লাসগো থেকে লন্ডন আসতো। তিনি বলেন, ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে তাদের কিছুটা সমস্যা ছিল। তাদের কেস পাশ হচ্ছিল না। যে কারণে জামেয়াতে পড়া সত্ত্বেও সেখান থেকে লন্ডন আসতে হতো আর প্রতি দুই সপ্তাহে গ্লাসগো যেতে হতো। তিনি বলেন, আমি তাকে বলি, তোমাদের তো অনেক কষ্ট হয়। এর উত্তরে সে বলে, বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছোট ছোট কষ্ট কোন কষ্ট নয়। ওয়াসীম ফযল নামে জামেয়ার একজন শিক্ষক বলেন, মাযহার আহসান অত্যন্ত সাহসী, গম্ভীর, ভদ্র এবং অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিল। এই প্রিয়ভাজন সেই অল্প সংখ্যক ছাত্রদের গন্ডীভুক্ত ছিল যারা নিজ দায়িত্বকে পূর্ণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও অধ্যবসায়ের সাথে পালন করে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সে অত্যন্ত যোগ্য ছিল। তিনি বলেন, আমাদের হোস্টেল পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কয়েক বছর যাবৎ সে প্রিফেক্ট হিসেবে দায়িত্ব পালান করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। একবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব এই প্রিয়ভাজনের ওপর অর্পণ করা

হচ্ছিল, তখন কেউ একজন বলে, সে কি এ কাজটি করতে পারবে? এ কথার প্রেক্ষিতে একজন শিক্ষক এই প্রিয়ভাজন ছাত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, কোন কাজের দায়িত্ব দেয়ার পর তো আমাদেরই মাযহারের কাছে থেকে লুকাতে হয় কেননা সে তখন আমাদের চেয়ে অধিক উদ্বেগ, গুরুত্ব ও অধ্যবসায়ের সাথে সেই কাজে নিমগ্ন হয়ে যায়। এই প্রিয় ছাত্রের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক যোগ্যতা ও নিঃস্বার্থ সেবা সম্পর্কে এ কথার মাধ্যমেও অনুমান করা যায় যে, এই শিক্ষক বলেন, কয়েক বছর পূর্বে জামেয়ার বাৎসরিক খেলাধূলা প্রতিযোগিতার সময় এই প্রিয়ভাজন ছাত্রকে আপ্যায়ন বিভাগের দায়িত্ব দেয়া হয়। খেলাধূলার শেষ দিন প্রচুর দর্শকের সমাগম ঘটে এবং তাদের দুপুরের খাবারেরও ব্যবস্থা করা হয়। সেই সময় এই প্রিয়ভাজন ছাত্র সারা রাত জেগে সমস্ত ব্যবস্থাপনামূলক কাজে উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে এবং এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নেয়নি, আর পরের দিনও সে একই আনন্দের সাথে নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে। প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পর এই প্রিয়ভাজন ছাত্র এই বিভাগ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গীন রিপোর্টও প্রস্তুত করে যা এখনও ব্যবস্থাপনার নিকট রয়েছে। আর সেই রিপোর্টের মাধ্যমে এই বিভাগের কাজের ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য হচ্ছে।

হাফেয মাশহূদ সাহেব বলেন, কয়েক দিন পূর্বে এই স্নেহভাজন ছাত্রের সাথে ফোনে কথা হলে সে বলে, আমি যত দ্রুত সম্ভব সুস্থ্য হয়ে একজন মুবাল্লিগ হিসেবে ধর্মের সেবা করতে চাই। সে আরও বলে, বর্তমানে আমার চিকিৎসা চলছে আর আমি আমার স্থানীয় জামাতে কাজ করা শুরু করে দিয়েছি। একইভাবে একবার এই প্রিয়ভাজন বলে যে, সে গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিতব্য পাঁচ কিলোমিটার চ্যারিটি ওয়াকে অংশগ্রহণ করবে, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি। মুরুব্বী সিলসিলাহ্ মালেক আকরাম সাহেব সেখানে ছিলেন, তিনি লিখেন, মাযহার আহসান সাহেবের পরিবার যখন দুবাই থেকে গ্লাসগোতে স্থানান্তরিত হয় তখন এই অধম স্কটল্যান্ডে মুরুব্বী হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করছিলাম। যেদিন এ পরিবারটি গ্লাসগোতে আসে সে দিনই মসজিদে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছিল যাতে এই পরিবারটিও অংশগ্রহণ করে, আর আমি দেখেছি, মাযহার আহসান প্রাথমিক পরিচয় পর্ব শেষ করেই সোজা রান্না ঘরে চলে যায় এবং সেখানকার কর্মীদের সাথে মিলে পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে সব কাজ করতে থাকে। প্রথম দিন থেকে শুরু করে জামেয়াতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সবসময় সে মসজিদ ও জামাতের খুব সেবা করেছে। সে অত্যন্ত মিতভাষী, সাদা প্রকৃতির অধিকারী একজন মানুষ ছিল যার বাহ্যিকও পরিষ্কার আর অভ্যন্তরও স্বচ্ছ। সে কখনো খোশগল্পেও মত্ত হয়নি আর সময়ও নষ্ট করেনি। সময়ের সঠিক ব্যবহারের পদ্ধতি তার জানা ছিল। মুরুব্বী সিলসিলাহ্ হওয়ার সুবাদে সে এই অধমের কাছাকাছি থাকত, আর খাকসার তাকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি। সে একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারী, মিষ্টভাষী এবং সবাইকে সম্মান ও মর্যাদা দানকারী যুবক ছিল। তার মনে এই আকাঙ্খা ও ব্যকুলতা ছিল যে, তার ওয়াক্‌ফ যেন গৃহীত হয় এবং সে যেন জামেয়া আহমদীয়ায়

ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে মুবাল্লিগ হতে পারে এবং ধর্মের সেবা করতে পারে। যেদিন জামেয়ায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় সেদিন সে এত আনন্দিত ছিল যে, সারা পৃথিবীর নিয়ামত যেন সে লাভ করেছে।

খিলাফতের প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা ছিল। গ্লাসগোর কায়েদ আরশাদ মাহমূদ সাহেব লিখেন, এ অধম শারজাহ্‌র খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ মনোনীত হই। আগে তিনি শারজাহ্‌য় থাকতেন আর মাযহার আহসানও সেখানেই থাকতো। তিনি বলেন, শারজাহ্‌য় অবস্থানের সময় জামাতী প্রোগ্রাম ও ইজতেমাগুলোর জ্ঞানগত ও শারীরিক প্রতিযোগীতায় তাকে অধিকহারে অংশগ্রহণ করতে দেখি। তিনি বলেন, আমরা যেহেতু শহরের বাহিরে দূরবর্তী একটি স্থানে ইজতেমার আয়োজন করতাম কাজেই আমাদেরকে অনেক আগেই সেখানে গিয়ে ওয়াকারে আমল এবং অন্যান্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হতো। মরহুম অল্প বয়সী হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা এ ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকত। তিনি বলেন, সে সর্বদাই অত্যন্ত সাহসী ছিল। এ কথার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, ইজতেমাতে উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগীতা হচ্ছিল আর যেহেতু এটি কঠিন এক প্রতিযোগিতা ছিল এবং বক্তৃতার বিষয়বস্তুও কঠিন ছিল আর কোন প্রস্তুতিও তার ছিল না তবুও সে এতে অংশগ্রহণ করে। অন্যান্য খোদ্দাম তার বক্তৃতা শুনে হাসাহাসি শুরু করে দেয় কিন্তু মাযহার আহসান যেভাবেই হোক তার বক্তৃতা সম্পূর্ণ করে আর কোন লজ্জা বোধ করেনি এবং পরে বলে যে, আমি যদি এতে লজ্জা বোধ করি তাহলে আমার কোন উপকার হবে না, লজ্জা তো এভাবেই ভাঙ্গতে হয়। এরপর আরো বলে, আমাদের খাদেমদের প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে ঐকান্তিক হওয়া উচিত। মানুষ হাসছে কি হাসছে না, এ সবের কোন তোয়াক্কা সে করেনি। সে বলে, লজ্জা ভাঙ্গার একটিই পদ্ধতি, আর তা হলো যেভাবে পারি সেভাবেই যেন আমি বলতে থাকি। আমাদের একজন গাম্বিয়ান মুরুব্বী সিলসিলাহ্ আছেন, যিনি গত বছর জামেয়া থেকে পাশ করেছেন। তার নাম আব্দুর রহমান চাও। তিনি বলেন, জামেয়ায় অধ্যয়নরত অবস্থায় এই প্রিয় ভাই-এর সাথে অনেক সময় অতিবাহিত করেছি। জামেয়া পাশ করার পর আমরা হোয়াটস্‌এ্যাপ-এর মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করেছি। তিনি বলেন, আমি সেই সব ম্যাসেজ উপস্থাপন করছি যা আমার এই প্রিয় ভাই মাযহার সাহেব তার অসুস্থতার পর আমাকে পাঠিয়েছে। সেগুলোর একটি হলো, আমি অসুস্থতার মাঝেও এই দিনগুলো অতিবাহিত করতে পারছি বটে তবে বাস্তবতা হলো আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন, এদিক থেকে আমার উচিত আরো বেশি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। কাজেই এই কষ্টের মাঝে দিন অতিবাহিত করাকে আমি কষ্টকর মনে করি না। আরেকটি ম্যাসেজ হলো, আমি অসুস্থতা নিয়ে ভাবছি না বরং আমি আমার লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছি আর তা হলো আমি কিভাবে জামাতের সর্বোত্তম সেবা করতে পারবো।

তার সহপাঠী ও বন্ধু শেখ সামার সাহেব যিনি এখন মুরুব্বী হয়ে গেছেন তিনি বলেন, সে সর্বদা হাস্যোজ্জল থাকতো এবং অন্যদের খুশি রাখতো। মাযহার আহসান সবার সাথে একই রকম ব্যবহার করতো যেন শুধুমাত্র সে-ই তার বন্ধু। কাউকে কোন প্রকার দুরত্ব বা পার্থক্য অনুভব করতে

দিতো না। সে কখনো কারো সাথে ঝগড়া করেনি। তার হৃদয় অনেক প্রশস্ত ছিলো। প্রতিটি ক্ষেত্রে তবলীগ করতো। তবলীগের কোন সুযোগ হাতছাড়া করতো না। হাসপাতালে থাকাকালে সেখানেও বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলো যে, এ এমন মুসলমান যে প্রত্যেককে তবলীগ করে। তার কারণে কেউ কোন কষ্ট পায়নি। সে কখনো কাউকে কোন খারাপ কথা বলেনি। অন্যদেরকে সাহায্য যতটুকু করতে পারতো তার চেয়েও বেশী করতো। ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতো। প্রত্যেকের সাথে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে থাকতো।

তার একজন সহপাঠী মুরুব্বী সাহের মাহমুদ সাহেব বলেন, এমন উন্নত একজন ব্যক্তিত্বের সাথে সাত বছর থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। সে অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী ছিল যা খুব কমই পাওয়া যায়। অতিথি আপ্যায়ন এবং বিনয়ের উন্নত দৃষ্টান্ত, সর্বদা সুধারণার মনোভাব প্রদর্শনকারী, সকল কাজে পবিত্র নিয়্যত ছিল তার। জামেয়ায় প্রাথমিক দিনগুলোতে সে প্রিফেক্ট ছিলো। একজন প্রিফেক্টের কাজ হলো, সর্বদা সময়মত শোয়ার তাগাদা দেয়া, সময়মতো লাইট বন্ধ করে ছেলেদের শোয়ার জন্য বলা, নামাযের জন্য জাগানো, রুম পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে মনোযোগ আকৃষ্ট করা, কখনো কোন ঝগড়া হলে তা থামানো ইত্যাদি। সে যখন এসব করা থেকে বারণ করতো ছাত্ররাও তখন তাকে বিরক্ত করতো আর বলতো যে, বিরক্ত করতে আমাদের খুবই মজা লাগে। তিনি বলেন, একবার খাকসার কোন ভুল করে ফেলি যার জন্য সে আমাকে ধমক দেয় এবং কিছুক্ষণ পর আমার কাছে এসে ক্ষমা চাইতে শুরু করে এবং কেঁদে ফেলে। সে অত্যন্ত নরম মনের মানুষ ছিল। তিনি বলেন, আমি কখনো অসুস্থ্য হলে অথবা অন্য কোন কারণে শরীর খারাপ থাকার ফলে শুয়ে থাকলে ছুটির দিনে আমার উঠার পূর্বেই সে আমার বিছানার পাশে নাস্তা এনে রেখে দিতো। আর কখনো সর্দি হলে আমাকে জিজ্ঞেস না করেই সাথে সাথে গরম পানিতে মধু মিশিয়ে আমার জন্য নিয়ে আসতো। এছাড়া আমার (অর্থাৎ হুযূরের) সাথে যেসব সাক্ষাৎ হতো, অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সেগুলোর উল্লেখ করতো। তিনি বলেন, মোটকথা প্রাণবন্ত, নিষ্ঠাবান, বিনয়ী, পুণ্যবান, ধর্মের সত্যিকার সৈনিক, তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত, পরিশ্রমী এই সমস্ত শব্দ মাযহারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, সে নিজের জন্য যা পছন্দ করতো তা তার বন্ধুদের জন্যও পছন্দ করতো। খাবারের কোন জিনিস আনলে বন্ধুদের জন্যও নিয়ে আসতো। খুবই সাদাসিধে জীবনযাপন করতো। তাকে কখনো অনর্থক কোন ব্যয় করতে দেখিনি যেমনটি যৌবনে অনেক ছেলে করে থাকে। তার সহপাঠীরা বলে, পরিচ্ছন্নতার প্রতি তার বিশেষ মনোযোগ ছিল। নিয়মিত নামায এবং তাহাজ্জুদের ব্যবস্থা করতো এবং আমাদেরও জাগিয়ে দিত। নিজ কক্ষে সে একটি জায়নামায রেখে দিয়েছিল। আমি অনেকবার তাকে রাতে উঠে নফল আদায় করতে দেখেছি। নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতি সপ্তাহে নফল রোযাও রাখতো এবং চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা নিতো। প্রতিটি বিষয়ে তার মাঝে শৃঙ্খলা ছিলো। নিজ সময়কে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে বন্টনকারী ছিল। জামেয়ার নিয়মিত রুটিনের বাইরেও তার রুটিন ছিলো: নিয়মিত কুরআন করীম পাঠ করা, জামাতী পুস্তক অধ্যয়ন, এছাড়া পরিবেশ

যেমনই হোক না কেন প্রতিদিন ব্যায়াম করা, নিয়মিত পত্রিকা পড়া এবং মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য হলেও দুপুরে কিছুটা বিশ্রাম নেয়া এবং শোয়ার পূর্বে রীতিমতো ডায়েরী লেখা, এগুলোও তার বিশেষত্ব ছিলো। নিয়মিত খুতবা জুমুআর নোট নিতো এবং খুতবার পয়েন্টগুলো বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতো। তিনি বলেন, খিলাফত এবং জামাতের জন্য সে ছিল নিবেদিতপ্রাণ। কখনো যুগ খলীফা অথবা জামাতের নেযামের বিরুদ্ধে কোন কথা সহ্য করতো না। প্রত্যেক তাহ্‌রীকে অংশ নিতো এবং অন্যদেরও স্মরণ করাতো। নিজেকে যুগ খলীফার সৈনিক মনে করতো এবং সত্যিকার অর্থে তা-ই ছিল। সে প্রায়ই বলতো যে, খিলাফতের জন্য আমি নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আর এটি শুধু বুলিসর্বস্ব কথা ছিল না বরং তার আচার আচরণেও এটিই প্রকাশ পেত যে, সে যা বলছে তাই করবে। তাঁর বন্ধু বর্ণনা করেন যে, ক্যান্সার ধরা পড়ার পর সে আমাদেরকে এই বলে সাহস যোগায় যে, চিন্তা করো না, শুধু খোদা তা'লার সামনে বিনত হও। খোদা তা'লার ওপর তার দৃঢ় বিশ্বাস ও ভরসা ছিল। নিজ অসুস্থতাকে সে নিজের জন্য এক পরীক্ষা হিসেবে মনে করেছিল। কারো সামনে কখনো কোন প্রকার অস্থিরতা বা কষ্টের বহিঃপ্রকাশ সে করেনি।

তার এক বন্ধু মুরুব্বী শারজিল সাহেব লিখেন, সে অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং প্রিয় বন্ধু ছিল। সে অনেক গুণের অধিকারী ছিল। যত্নবান, খিলাফতের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবনকারী এবং আল্লাহ্ তা'লা প্রতি গভীর আস্থাশীল ছিল। জামাতের জন্য সবকিছু কুরবান করতে প্রস্তুত ছিল। একজন নিবেদিত প্রাণ মানুষ ছিল। কখনো কাউকে কোন প্রকার কষ্ট দিতো না এবং কারো কোন ক্ষতি করতো না। সর্বদা হাস্যোজ্জল থাকত। কেউ তাকে যত বিরক্ত-ই করুক না কেন সে কখনো রাগান্বিত হতো না। কখনো উত্তেজিত হয়নি। কখনো অযথা কোন কথা বলত না। মন্দ কথা এড়িয়ে চলতো। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে মন্দ ভাষা ব্যবহার করতে দেখেনি। সর্বদা প্রতিটি কাজ অত্যন্ত ধৈর্য্য ও উৎসাহের সাথে এবং মনোযোগ ও পরিশ্রম এবং দায়িত্ব সহকারে পালন করতো। কোন কাজকে কখনো ছোট মনে করতো না। সবার সাহায্য করতো। তার মাঝে বিন্দুমাত্র অলসতা ছিল না। জামেয়াকে খুবই ভালোবাসতো। অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত ছিল, কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সাহস হারায়নি এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে নিজের অসুস্থতাকে সহ্য করেছে। তিনি বলেন, সে কখনো কারো প্রতি হাসি-ঠাট্টা করেনি বরং অন্যদেরও তা থেকে বিরত রাখত। তার মাঝে সেসব গুণাবলী ছিল যা একজন মুরুব্বীর মাঝে পাওয়া যায়। তার বন্ধুরা এই কথাও বলেছে যে, সে মুমাহাদা (প্রথম বর্ষ) থেকেই পূর্ণ মুরুব্বী ছিল। তাকওয়ার ওপর পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখতো। একবার বলে যে, আমার ট্রিমারে শব্দ অত্যন্ত বেশি হয় তাই অন্যরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন আমি ট্রিম করি না।

তার মাঝে কোন প্রকার লৌকিকতা ছিল না। ভিতরে যেমন ছিল বাইরেও একই রকম ছিল। তার কথা ও কাজে সামঞ্জস্য ছিল। কুরআনের আদেশ পালনকারী ছিল। তার নোটস তো ভাল ছিলই, কিন্তু কুরআন অনুবাদের নোট্‌সও নিয়মিত করতো যার ফলে তার অনুবাদও অনেক ভালো মানের

ছিল। জামেয়ার একজন ছাত্র আফাক সাহেব যিনি এখন মুরুব্বী হয়ে গেছেন, তিনি পাকিস্তান থেকে এসে এখানে ভর্তি হন। প্রথমে কিছুদিন তিনি পাকিস্তান জামেয়ায় পড়াশোনা করেন, অতঃপর তার পরিবার এখানে চলে আসলে তিনিও এখানে চলে আসেন। তিনি বলেন, অন্যরা আমার সাথে দেখা করতে আসলে মাযহারও আসে আর দুই মিনিট থেকে সে চলে যায় এবং বিছানাপত্র ও বালিশ নিয়ে ফেরত আসে। সে বলে, তুমি যেহেতু এসব জিনিস নিয়ে আসনি তাই আমি এগুলো তোমাকে দিলাম কেননা তোমার এসব জিনিসের প্রয়োজন পড়বে। তিনি আরো বলেন, আমাদের ক্লাস তিন মাস পূর্বে আমাদের এই প্রিয় ভাইয়ের সেবা শুশ্রূষার জন্য স্কটল্যান্ড যায় তখন তাকে অত্যন্ত আনন্দিত দেখাচ্ছিল। যখন আমরা তার বাসায় সাক্ষাৎ করতে যাই তখন সেখানে পূর্ব থেকেই খাবারের ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল আর সে আমাদেরকে কিছু না কিছু খাওয়ার জন্য জোর দিয়ে বলছিল। যাহোক, সে অত্যন্ত ভদ্র এবং ওয়াকফ-এর রূহ ধারণকারী একজন মানুষ ছিল। যদিও আল্লাহ্ তা'লা তাকে দীর্ঘায়ূ দান করেননি, মাত্র ২৬ বছর বয়সেই তার মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু যেখানেই সুযোগ হয়েছে সে নিজ বন্ধুদেরও তরবিয়ত করেছে, আর যখনই তবলীগের সুযোগ হয়েছে তবলীগও করেছে এবং প্রকাশ্যে তবলীগ করেছে, এমনকি শেষ সময়েও সে নিজের সামনে কিছু না কিছু লিখে টানিয়ে রাখতো যেন প্রত্যেক ডাক্তার এবং নার্স, যারাই আসে তারা যেন তা পড়ে। অসুস্থতার সময়ও হাসপাতাল ও বাড়ীতে কয়েকবার তার সাথে ফোনে আমার কথা হয়, তখনও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে উত্তর দিত। বরং একবার তো, তার মা বলেন, ঔষধের প্রভাবে তার মুখে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল যার কারণে সে কথা বলতে পারতো না, কিন্তু আমার সাথে যখন কথা বলছিল তখন সে সাবলীল ভাবেই কথা বলছিল। আর আমি তাকে এই কথাও বলি যে, তুমি বিশ্রাম নাও, কিন্তু সে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বলে, এখন আমার মুখের ফোস্কা আমাকে কোন কষ্ট দিচ্ছে না। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা করেছিলেন, এরপর তার ফোস্কা ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

সে একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত, নিজের জীবনের উদ্দেশ্য অনুধাবনকারী আহমদী ছেলে ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি সর্বদা রহমত বর্ষণ করুন, তার মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন। আমরা সর্বদা তাকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে নিজ প্রিয়দের পদতলে স্থান দান করুন এবং তার মত এমন আরো শত-সহস্র জীবন উৎসর্গকারী যেন জন্ম নেয় যারা এমন সূক্ষ্মভাবে নিজেদের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। সেইসাথে বিশেষ করে তার পিতামাতা ও বোনদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে ধৈর্য্য ও দৃঢ় মনোবল দান করেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) খুতবা সানিয়ার মাঝে বলেন, জুমুআর নামাযের পর আমি তার জানাযা পড়াব। হাযের জানাযা এটি। আমি নিচে যাব এবং বন্ধুরা এখানেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবেন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।